The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol.33, 2015 (P. 241-254)

বিদ্যাসাগরের সমাজ ও পরিবার-বিচ্ছিন্নতা: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ফাতেমা-তুজ-জোহরা [1]
লোকমান কবীর [2]

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিকে বাংলা গদ্যের জনক; অন্যদিকে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারক। দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি সুখ্যাত। কুসংস্কার দূর করে যিনি বাঙালি সমাজকে আলোকিত করতে চেয়েছেন, তাঁকেই আমরা শেষ জীবনে পরিচিত লোকালয় ছেড়ে কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের সাথে বসবাস করতে দেখি। এই স্বসমাজত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে তাঁর ভেতরে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধকে চিহ্নিত করা যায়। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা দেখে, কাছের ও দূরের মানুষের কাছে কারণে-অকারণে মানসিক আঘাত পেয়ে, তাঁর মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিদ্যাসাগরের এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস প্রমুখের বিচ্ছিন্নতাবোধের তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। অস্তিত্ববাদী দর্শন দ্বারাও তাঁর অন্তর্সত্তায় সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ ও কারণকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একজন স্বনামখ্যাত আলোকিত মানুষ। উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারে তিনি অনন্য উদ্যমী কর্মী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি চাকুরিজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেয়েছেন, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দক্ষিণ বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিদর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। এসময় তিনি শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য নিয়েছিলেন নানা উদ্যোগ ও আয়োজন। একই সঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন, বহুবিবাহ প্রথা রোধ করার জন্য করেছেন নিরলস পরিশ্রম। বিশেষ করে বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বাধিক উজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয়। বাঙালি রক্ষণশীল সনাতন সমাজের কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করে আলোক-আবাহন করেছেন তিনি। নানান প্রতিকূল পরিবেশ, সমালোচনা এমনকি প্রাণসংশয়সম্ভাবনাতেও সমাজসংস্কারে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজ উদ্যমে অবিচল। কিন্তু সমাজসংস্কারের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং পারিবারিক বিভিন্ন ঘটানাক্রমে তাঁর ভিতরে জন্ম নিচ্ছিল নানামাত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। তিনি ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ১২ অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁর মাকে লেখা চিঠির শুরুতেই বলেন, "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার

[1] সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ।
[2] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ।

ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি।" (উদ্ধৃত: বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪৫৪-৪৫৫) একই তারিখে স্ত্রী দীনময়ী দেবী ও ২৫ অগ্রহায়ণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রেও একই সুরে কথা বলেন বিদ্যাসাগর। এরপর জীবনের শেষ পর্ব তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে কার্মাটাড়ে কাটিয়ে দেন। নিজ সমাজ ত্যাগ করে, স্বজনদের ছেড়ে সাঁওতাল-সমাজে বসবাসের কারণ হিসেবে তাঁর ভেতরে সৃষ্ট বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতাবোধকে দায়ী করা যায়। যদিও মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। এ বিষয়ে সমালোচক বলেন,"The history of man could very well be written as a history of the alienation of man." (Erich Kahler, 1957 : 43) তবে প্রাচীনকাল থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে মানুষের বসবাস থাকলেও বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ ও ফল আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। "বস্তুত, সমাজের মৌলকাঠামো ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার জঙ্গমবিরোধ, বহির্লোক ও অন্তর্লোকের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, এবং পরিশ্রম ও প্রাপ্তির অসীম ব্যবধানই আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার মৌল কারণ।" (ঘোষ, ১৯৯৭ : ২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ হিসেবে তাঁর সমাজসংযুক্তির ফলে সৃষ্ট নানামুখী বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, আপনজনদের নিকটে পাওয়া মানসিক আঘাত প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা যায়। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলেই জীবনের শেষাংশে যখন তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল, যখন আপনজনের সাহচার্য তাঁর বেশি প্রয়োজন, তখনই বাঙালি সমাজ ও স্বজনদের ছেড়ে তিনি চলে যান সাঁওতাল জনপদ কার্মাটাড়ে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছেন সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ও সমাজসংস্কার প্রচেষ্টায়। সমাজকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন তিনি, সবসময় চেয়েছেন সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির মুক্তি। পরোপকারী ও দানশীল হিসেবেও সুখ্যাত ছিলেন তিনি। সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত এই ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় স্বসমাজ ত্যাগ করেন, তখন তাঁর ভিতরে বিচ্ছিন্নতাবোধের বীজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। তাঁর এই বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ ও কারণ উদ্ঘাটন করা জরুরি। সেই সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে গবেষণাকর্ম খুব কম পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই, এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমরা আগ্রহী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ পর্বে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ উদ্ঘাটন করে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার স্বরূপকে খতিয়ে দেখাই এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মাধ্যমিক উৎস নির্ভর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। বিদ্যাসাগরের লিখিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকেও

সংগৃহীত হয়েছে নানা তথ্য ও উপাত্ত। বিচ্ছিন্নতাবোধের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাত্ত্বিকদের চিন্তা ও উপলব্ধিকে যথাযথ তথ্যসূত্র প্রদানের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে, গুণগত পদ্ধতিতে (qualitative method) গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবোধের তাত্ত্বিক ধারণা

বিচ্ছিন্নতাবোধ হল এমন একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তি তার নিজের সত্তা এবং একই সাথে অন্য মানুষ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন অনুভব করে। "কোন কিছুর গুণ বা শক্তিতে তার মূল আধার নিরপেক্ষভাবে স্বকীয় সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করাকে দর্শনে বিচ্ছিন্নতা বলা হয়।" (করিম, ২০০৬ : ৪২) রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা পাওয়া গেলেও, স্বতন্ত্র প্রত্যয় হিসেবে সমাজতত্ত্বে এই ধারণা প্রবেশ করেছে জার্মান ভাববাদী স্কুলের দ্বারা। বিশেষ করে নব্য হেগেলীয়দের লেখালেখির কারণে এই ধারণার উন্মেষ ঘটে। জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। হেগেল মনে করেন ঈশ্বর হচ্ছেন পরম সত্তা এবং মানুষ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্তা। এ কারণে জন্মগতভাবেই মানুষ নিজস্ব সত্তার মাঝে বিচ্ছিন্নতাবোধকে লালন করে। লুডউগ ফয়েরবাখও (১৮০৪-১৮৭২) হেগেলের মতো বিচ্ছিন্নতাকে ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে ফয়েরবাখ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফয়েরবাখ মনে করেন, ধর্মচিন্তা করে বলেই মানুষ বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়। হেগেলের সমালোচনা করে ফয়েরবাখ বলেছিলেন : "মানুষ আত্ম-বিচ্ছিন্ন পরমাত্মা নয়। বরং পরমাত্মা হল আত্ম-বিচ্ছিন্ন মানুষ। এই পরমাত্মা মানুষের সত্তাসারের এক বিমূর্ত এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এক চরম রূপ। মানুষ নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে, তাকে নিজের মাথার উপর বসিয়ে, তার মহত্তর গুণ আরোপ করে নিজেই তার দাস হয়ে পড়ে।" (সুধীর, ২০১০ : ৭৪) অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরম সত্তা আগে থেকেই বিদ্যমান নন। মানুষই তাঁর কল্পনার মধ্যে জন্ম দেন ঈশ্বর বা পরম সত্তার। ফলে জন্ম হয় বিচ্ছিন্নতাবোধের। ফয়েরবাখের মত ছিল, ঈশ্বরকে বিলোপ করার মাধ্যমেই মানুষ তার বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করতে পারবে।

কার্ল মার্কসও (১৮১৮-১৮৮৩) বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিশ্লেষণ করেন। বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত আলোচনায় মার্কস দুটি জার্মান শব্দের সাহায্য নেন। প্রথম শব্দ হলো 'Entäußerung' যার অর্থ নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। দ্বিতীয় শব্দ 'Entfremden'-এর অর্থ, একজন মানুষ থেকে আরেকজন বিচ্ছিন্ন হওয়া। "এক কথায়, মার্কসের মতে বিচ্ছিন্নতাবোধ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু যে তাঁর নিজস্ব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তা নয় বরং একজন মানুষ অন্য মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়।" (আলী, ১৯৯৮ : ২০২) মার্কস বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে সামাজিক দিককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিশ্লেষণ করেছেন পুঁজিবাদী সমাজের প্রেক্ষাপটে। এই সমাজে মানুষ যখন তাঁর সৃষ্ট উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তার মাঝে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ। পুঁজিবাদী সমাজে কোনো ব্যক্তির চার ধরনের বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করেছেন মার্কস । এগুলো হল:

১. কর্ম বা কর্মপদ্ধতি থেকে বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা;
২. উৎপন্ন সামগ্রী হতে বিচ্ছিন্নতা;
৩. আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা; এবং
৪. মানব-প্রকৃতি তথা মানবিক-সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা।

মার্কসীয় ব্যাখ্যায় এই চার প্রকার বিচ্ছিন্নতাবোধেরই প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রমের ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতা (ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৩)। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা দূর হবে বলে মার্কস মনে করতেন। মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণা ও ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর প্রদত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ বিষয়ক ধারণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে অনেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। Aron বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে মার্কসীয় ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন:

> In Marxism, including the writings of young Marx, the process of Alienation instead of being process which is philosophically inetiatable, become the expression of a sociological process by means of which men of societies construct collective organizations in which they become lost. (Aron, 1991 : 148)

D. G. Mitchel প্রদত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধের সংজ্ঞার্থেও আমরা কার্ল মার্কসের প্রভাব দেখতে পাই। তাঁর মতে:

> Alienation is a socio-psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspect of his social existence. (Mitchel, 1968 : 4)

মেলভিন সিম্যান বিচ্ছিন্নতাবোধের পাঁচটি ধরন বা অবস্থা খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো হল :

১. কর্তৃত্বহীনতা (powerlessness);
২. অর্থহীনতা (meaninglessnes);
৩. আদর্শহীনতা (normlessness);
৪. সম্পর্কহীনতা (isolation); এবং
৫. আত্ম-সংযোগহীনতা (self-estrangement) (Melvin seeman, 1959 : 783-791)|

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের মতে, সমাজের ভিত্তি হলো সমষ্টিগত চেতনা। এর দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ। আবার 'সমষ্টিগত চেতনা'কে পূর্ণ শক্তিশালী করার মাধ্যমেই অবসান হতে পারে বিচ্ছিন্নতাবোধের। বিচ্ছিন্নতা, কখনো কখনো ব্যক্তিচৈতন্যে সৃষ্টি করে এমিল ডুর্খেইম (১৮৫৮-১৯১৭)-কথিত Anomie বা আচরণগত আদর্শহীনতা ও নৈরাজ্যপ্রবণতা। "নৈরাজ্যবাদী মানুষের কাছে বিলুপ্ত হয়ে যায় মানবিক দায়িত্ববোধ, এবং যতই মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হয়, ততই সে হতে থাকে মানবসমাজ থেকে বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন।" (ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৮)

সোরেন কিয়ের্কেগার্ড, এডমন্ড হুর্সেল, মার্টিন হাইডেগার, জ্যাঁ পল সার্ত প্রমুখ দার্শনিক বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যাখ্যা করেছেন অস্তিত্ববাদের আলোকে। অস্তিত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন মানুষের ইচ্ছার বা কোন কিছু নির্বাচন করার স্বাধীনতা আছে। মানুষ স্বাধীনভাবে তাঁর কর্ম বেছে নেবে এবং কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে। যখনই ব্যক্তির উপর কোনো বহির্শক্তির ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে, তখনই মানুষের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে– সৃষ্টি হবে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা। সিগমন্ড ফ্রয়েড, গুস্তাফ ইয়ুঙ, আর. ডি. ল্যাঙ, এরিক ফ্রম প্রমুখ দার্শনিকও বিচ্ছিন্নতার বহুকৌণিক দিক ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ফ্রয়েডের মতে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের মূল কারণ তার লিবিডো বা অবচেতন যৌনতা। মানুষের মৌলিক জীবনাবেগ ও আদিম প্রবৃত্তির অবদমন তার বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করেন ফ্রয়েড।

মার্কসের সমাজকাঠামো বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ফ্রম। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী রূপ মানবিক সম্পর্কের মাঝে এনেছে বৈষয়িক স্বার্থচেতনা। পণ্যের অবাধ বিস্তার ও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে আন্তঃমানবিক সম্পর্কে ও বন্ধনে ধরেছে ক্ষয়। ফলে মানুষ তার সত্তা থেকে হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্নতার এই দিগন্তবিস্তারী রূপ সম্পর্কে এরিক ফ্রম বলেন :

> Alienation as we find it in modern society is almost total: it pervades the relationship of man to his work, to the things he consume, to the things we consumes, to the state, to his fellow men, and to himself. (Fromm, 1968 : 124)

ফ্রমের মতো আর. ডি. ল্যাঙও বিচ্ছিন্নতা-বিশ্লেষণে ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব ও সমাজকাঠামোর উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, বিচ্ছিন্নতা একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হলেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের মূল উৎস লুকায়িত থাকে সমাজ-অভ্যন্তরে। (ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৭)

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা: কারণ ও স্বরূপ

বর্ণের দিক থেকে ব্রাহ্মণ হলেও অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে বিদ্যাসাগর একেবারে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজসংস্কারক ও সমাজচিন্তকদের প্রায় সবাই ছিলেন পারিবারিকভাবেই প্রভাবশালী, অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের কথা। সে দিক থেকে বিচার করলে বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রমী এবং নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা কখনো তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ও সমাজসংস্কার কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সময় নানারকম প্রতিকূল প্রতিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তেমনি পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাও অনেকাংশে ভূমিকা রেখেছে বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টিতে। এসব দিক বিশ্লেষণ করেই আমরা বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ ও কারণকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

১. সমাজসংযুক্তি বনাম ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসচেতন ও সমাজসংযুক্ত মানুষ। সনাতন রক্ষণশীল সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছেন, সক্রিয় থেকেছেন সমাজসংস্কারে। ভবিষ্যতের সমাজকে বদলানোর জন্য তৈরি করতে চেয়েছেন শিক্ষিত বাঙালি, তাই মনোযোগী ছিলেন শিক্ষা সংস্কারে। অন্যদিকে সনাতন সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা দূর করতে তাঁকে চালাতে হয়েছে অবিরত সংগ্রাম। এসব মহৎ প্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অন্তর্সত্তায় সৃষ্টি হয়েছে নির্বেদ ও নৈঃসঙ্গ্য– যার অনিবার্য ফল হিসেবে জন্ম নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ।

১.১ শিক্ষা সংস্কার: নিঃসঙ্গ অভিযাত্রা

১৮৪১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত পদে চাকুরিজীবন শুরু করেন বিদ্যাসাগর। এই কলেজে থাকাবস্থায় তিনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব পান। ফলে রচিত হয় তাঁর প্রথম অনুবাদমূলক গদ্যসাহিত্য *বেতালপঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭)। যদিও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে, তবুও বাংলা গদ্যভাষায় বিরামচিহ্ন প্রবর্তন করে ভাষার মাঝে "এক অন্তর্নিহিত ছন্দঃস্রোত" রক্ষা করে বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত হন তিনি। ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে যোগ দেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে ১৮৪৭ সালে সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। ১৮৫০ সালে তিনি যোগ দেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরানি পদে । সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন, তা রসময় দত্ত অনুমোদন দিতেন না। তাই নিজ আদর্শকে অম্লান রাখতে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেন :

> বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম সংঘাত শুরু হল এইখানে। শুরু হল, কিন্তু শেষ হল না। কারণ এ সংঘাত স্বার্থের সংঘাত নয়, আদর্শের সংঘাত। স্বার্থের সংঘাতের শুরু আছে, শেষও আছে। আদর্শের সংঘাতের শুরু আছে, শেষ নেই। (ঘোষ, ২০০১ : ১৫৮)

১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগ দেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫১ সালে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। শিক্ষাকে বাঙালি ছাত্রদের উপযোগী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে ৪টি পরিকল্পনাপত্র প্রণয়ন করেন। এসব পরিকল্পনায় ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিত মানুষ গড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। অধ্যক্ষ পদে থাকা অবস্থায় তিনি লক্ষ করেন যে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য বর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নেই। তিনি শিক্ষাকে সমাজের সকল বর্ণের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করলেন– সকল বর্ণের জন্য পাঠাধিকার নিশ্চিত করলেন সংস্কৃত কলেজে।

১৮৫৫ সালের ১ মে থেকে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের পাশাপাশি দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির জন্য সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এসময় তিনি তাঁর আয়ত্তে থাকা চারটি জেলায় ২০টি মডেল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা মাধ্যমের এসব স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ সালের ১৭ জুলাই স্থাপন করেন নর্মাল স্কুল। নর্মাল স্কুলে মূলত

শিক্ষকদের উপযুক্ত করে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে পর্যন্ত সময়ে তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয় জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৯ সালের ৭ মে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে বেথুন ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকেই তিনি এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বেথুন ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষাসংস্কারের মূল উদ্দেশ্যে ছিল শিক্ষিত জাতি তৈরির মাধ্যমে আলোকিত সমাজ নির্মাণ করা। কিন্তু তিনি যে সময়ে ব্রতী থেকেছেন শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে– তা ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক কাল। ফলে তাঁকে সমাজের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতির সঙ্গে আপস কিংবা সংগ্রাম করে চলতে হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদে থাকার সময় তিনি চেয়েছিলেন তাঁর কাজ করার স্বাধীনতা ও একক কর্তৃত্ব থাকবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন কখনো কখনো তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মোদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ১৮৫২ সালে তিনি ২৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত যে শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, তাতেও সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. ব্যালান্টাইন ১৮৫৩ সালে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে কলেজের শিক্ষার ধরন ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করার পরামর্শ দেন– যা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। শুধু ইংরেজ হওয়ার কারণেই বিদ্যাসাগরের সমমর্যাদার একজন অধ্যক্ষকে ঔপনিবেশিক সরকার অধিক গুরুত্ব ও সম্মান দিয়েছেন। নিজের শিক্ষাপরিকল্পনার উপর তাঁরই সমপদমর্যাদার একজন অধ্যক্ষের এই হস্তক্ষেপ বিদ্যাসাগর মেনে নিতে পারেননি। যদিও শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের যুক্তি ও দাবিই সরকার মেনে নিয়েছিল, তবুও সেটা ছিল সাময়িক।

১৮৫৭ সাল থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষাসংসদের মতপার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর একক কর্তৃত্ব প্রত্যাশা করেছেন। শূন্য পদের কোনো বিজ্ঞাপন না দিয়ে তিনি সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাপক হিসেবে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মোহিনীমোহন রায়কে নিয়োগ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়কে। শিক্ষা বিভাগের পরিচালক গর্ডন ইয়ং এই নিয়োগকে মেনে নিলেও, ভবিষ্যতে নিয়োগবিধি অনুযায়ী শূন্য পদের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পরামর্শ দেন। নিয়ম-নীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে গর্ডন ইয়ংয়ের পরামর্শ যৌক্তিক। তবে বিজ্ঞাপন ছাড়া শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পেছনেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারকৌশল লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করলে শিক্ষা বিভাগের কর্তারা তাঁদের পছন্দমত কিছু লোক ঢুকাতে পারবে। এসব শিক্ষক দিয়ে তিনি ভালোভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবেন না। এ কারণে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের এই কর্মপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারিতা মনে হলেও, সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

দক্ষিণ বাংলার সহকারী পরিদর্শক থাকা অবস্থায় তিনি যে সব বালিকা বিদ্যালয় চালু করেছিলেন, তাতে প্রাথমিকভাবে সরকারি সহায়তার আশ্বাস পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৮৫৮ সালের মে মাস

পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩৪৩৯.৫০ টাকা বাকি পড়ে যাওয়ার পর, বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে আশানুরূপ সহযোগিতা পাননি। শেষ পর্যন্ত একাধিক চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করলেও, সরকার এই বিদ্যালয়গুলির পরবর্তী ব্যয় চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে। এভাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিভিন্ন নীতির কারণে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছিল। এরপর শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে মতবিরোধ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন যে, তিনি আর স্বাধীনভাবে সংস্কারকাজ চালাতে পারবেন না। তাই তিনি শুধু বেতন পাওয়ার জন্য চাকুরিতে থাকতে চাইলেন না। ফলে ১৮৫৮ সালের ৫ আগস্ট শিক্ষা বিভাগের পরিচালকের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যগপত্র মঞ্জুর করা হয়। এভাবে দেখা যায়, চাকুরিজীবনে শিক্ষাসংস্কারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সবসময় স্বাধীনভাবে তিনি কাজ করতে পারেননি। অস্তিত্ববাদী দর্শন অনুযায়ী, মানুষ যদি স্বাধীনভাবে কাজ না করতে পারে তাহলে তার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হবে। আর এই সংকটাপন্ন অস্তিত্বের ফল হতে পারে বিচ্ছিন্নতাবোধ। তাই, চাকুরিজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরকে অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি করতে হয়েছে। এজন্য আমরা বলতে পারি বিদ্যাসাগরের বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রাথমিক বীজ তাঁর চাকুরিকালেই রোপিত হয়, যা পরবর্তী সময়ে রূপ নেয় বিরাট বৃক্ষে।

১.২ সমাজসংস্কার: বিচ্ছিন্নতাবোধের অনিবার্য বিস্তার

সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সমাজেকে দুইভাগে ভাগ করেন। প্রথমটি হল যান্ত্রিক সমাজ (Mechanical Society), দ্বিতীয়টি জৈবিক সমাজ (Organic Society)। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হল সাদৃশ্য, দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য বৈসাদৃশ্য। ডুর্খেইম আদিম সমাজকে যান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে এবং আধুনিক সমাজকে জৈবিক সমাজের সাথে তুলনা করেছেন। আদিম সমাজে মানুষে মানুষে সামাজিক সংহতি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। আধুনিক সমাজে সামাজিক সংহতি দুর্বল। ফলে সমাজে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি হলে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে পারে। আধুনিক সমাজে কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তিদের থেকে সামাজিক সংহতির অভাবে অসহায় বোধ করে এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্যক্তির আত্মহত্যাকে ডুর্খেইম 'Egoistic Suicide' বলেছেন। অপরদিকে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুব নিবিড় হলে অথবা ব্যক্তিসত্তা 'সমষ্টিসত্তা'য় রূপান্তরিত হলে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়। ডুর্খেইম এ ধরনের আত্মহত্যাকে 'Altruistic Suicide' নামে অভিহিত করেছেন। (আলী, ১৯৯৮ :২০৮) বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথম ভাগে আমরা তাঁকে সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে দেখি। জাতীয় স্বার্থে তিনি বহুবিবাহ দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন প্রভৃতি আন্দোলনে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন, "বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।" (মিত্র, ২০০১ : ৩০০) উপর্যুক্ত উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করার জন্য বিদ্যাসাগর প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত

ছিলেন। তাঁর এই মানসিকতাকে আমরা ডুর্খেইম-বর্ণিত সংহতির ধারণার সঙ্গে তুলনা করতে পারি; যেখানে সমাজের সঙ্গে বন্ধন শক্তিশালী হলে ব্যক্তি সমাজের প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। বিহারীলাল সরকারের (১৯৯১) বর্ণনা থেকেও আমরা জানতে পারি যে, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর ঘরের বাইরে বের হলে অচেনা লোক এসে তাঁকে ঘিরে ফেলত, ব্যঙ্গ করত, প্রহার করার কিংবা মেরে ফেলার ভয় পর্যন্ত দেখাত। কিন্তু বিদ্যাসাগর এসব দেখে ভয় পাননি। কারণ তখন তাঁর কাছে নিজের জীবনের চেয়েও সমাজের কল্যাণচিন্তা বড় হয়ে উঠেছিল। একারণে, এসময় তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন জেনেও বিদ্যাসাগর কলকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে দেখা করার সাহস দেখিয়েছেন। (সরকার, ১৯৯১ : ২০১-২০২) বিদ্যাসাগর নিজে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা তার নিজের পরিবারেও বাস্তবায়িত করেছেন। ১৮৭০ সালের ৮ নভেম্বর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দেন। আত্মীয়স্বজনের আপত্তির পরেও এই বিয়েকে সানন্দে বরণ করেছেন তিনি। অবশ্য তাঁর পুত্রেরও এতে সম্মতি ছিল।

এই বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে গিয়েই বিদ্যাসাগরের মনে হতাশা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ১১ বছরে ৬০টি বিধবাবিবাহ দিতে তাঁকে ৮২০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এতে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এসব বিধবাবিবাহে যাঁরা তাঁকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের ছেলে রমাপ্রসাদ রায় এমন ব্যক্তিদের অন্যতম। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিয়েতে কথা দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হননি তিনি। এমনিভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী অধিকাংশ ব্যক্তি সাহায্য না করায় বিপুল অঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা বিদ্যাসাগরের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। ফলে অত্যন্ত মনোবেদনা থেকে বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বিদ্যাসাগর বলেন :

> [...] আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ের সংবাদ লয়েন না।...(উদ্ধৃত, ঘোষ, ২০১১ : ২৭৬)

বিদ্যাসাগরের এই হতাশা তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধের অব্যবহিত পূর্বরূপ। বিচ্ছিন্নতাবোধের অনেক রূপভেদ থাকতে পারে। কখনও হতাশা, কখনওবা বিষণ্নতা, কিংবা নৈঃসঙ্গ্যের তীব্রতার মাঝে বিচ্ছিন্নতাবোধ লুকিয়ে থাকতে পারে। বিচ্ছিন্নতাবোধের এই বহুমুখী রূপ নিয়ে সমালোচক বলেন:

> The double meaning of the concept of alienation– its reference both to sociological processes and psychological states– is one of the reasons for the confusion prevailing in the literature. However, it is not unusual forconcepts in sociology of social psychology to have a double meaning. Take, for example, another much used concept, *frustration.* Here we find the same tendency. It refers both to those processes which block need-satisfaction and to the state of deprivation which is a consequence of

> blocked need-satisfaction. A similar situation is found in the use of the concept of *anomie.* (Israel, 1971 : 6)

ডুর্খেইম বিশ্লেষিত অ্যানোমি বা মূল্যবোধহীনতা প্রবল হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগরের চারপাশে। তিনি ক্রমে আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও, যাঁরা বিধবাবিবাহ করছেন, তাঁদের মাঝেও প্রচুর প্রবঞ্চক লুকিয়ে আছে। বিদ্যাসাগরের কাছে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার লোভে ও একাধিক বিবাহ করার প্রলোভনে, অনেকেই বিধবাবিবাহ করতে রাজি হতেন। অসহায়ত্বের ভান ধরে অনেক অপরিচিত লোকও তাঁর কাছে সাহায্য নিতেন। যাদের তিনি উপকার করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাসাগরের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলন করতে গিয়ে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির সমালোচনার মুখেও পড়েছেন তিনি। এই সমালোচকদের দলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিককেও আমরা পাই। বঙ্কিম তাঁর *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে সূর্যমুখীর লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন :"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করেছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" (চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬০ : ১৭৯) বিদ্যাসাগর শিক্ষিত সমালোচকদের এসব ব্যঙ্গ ও আঘাতের জবাব না দিলেও হয়তো এসব কটূক্তি তাঁকে ধীরে ধীরে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধাববিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করে লেখেন :

> সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
> তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন॥
> নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
> অকারণে হই হই, উপহাস সার॥

সমাজমধ্যস্থ মানুষের এসব প্রবঞ্চনা, কঠোর সমালোচনা ও বিদ্রূপ দেখে সমাজের সামষ্টিক চেতনায় বিদ্যাসাগর খুঁজে পেয়েছেন গভীর ক্ষত– যা তাঁকে নিমজ্জিত করেছে বিচ্ছিন্নতার অতল অর্ণবে। এ বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার (বিদ্যাসাগর) এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিকহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত, অপরদিকে মানুষের আচরণে ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাসবিহীন। এরূপ অবস্থা যে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, মানুষকে যাঁহারা প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছেন, আকাশসদৃশ বহুবিস্তৃত সমবেদনার প্রান্তরে যাঁহার হৃদয় ছুটাছুটি করিয়াছে, তিনিই কেবল বুঝিতে পারিবেন, মানুষের নির্মম ব্যবহারে– নিষ্ঠুরাচরণে হৃদয়ে সরস ভাব কতদূর বিনষ্ট হয় (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৪১৭)

২. পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি: বিচ্ছিন্নতার দুর্নিবার ফল

বিদ্যাসাগরের স্বভাবের মাঝে আমরা অত্যন্ত জেদ ও একগুয়েমি লক্ষ করেছি। বিনয় ঘোষ তাঁর জেদি সত্তাকে শিক্ষা ও সমাজসংস্কার কার্যক্রম সফল করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভাবলেও, ব্যক্তিগত জীবনে হতাশার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (ঘোষ, ২০০১ : ২২৬) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিদ্যাসাগর জেদ করে কিংবা অভিমান করে যে সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে

ফেলেছেন, তা থেকে আর কখনো নমনীয় হননি। ফলে বাল্যকাল থেকেই গভীর বন্ধুত্ব থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তিনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। যদিও মদনমোহনের মৃত্যুর পর, তাঁর মেয়ে ও মার ভরণপোষণের দায়িত্ব বিদ্যাসাগরই নিয়েছিলেন। মদনমোহনের সঙ্গে অভিমানের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, বিদ্যাসাগর বাইরের মানুষের দেওয়া আঘাত সহ্য করতে পারলেও, খুব ঘনিষ্টজনের কাছে পাওয়া কষ্ট মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতার প্রথম সন্তান হিসেবে পরিবারের সকলের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। দরিদ্র পিতার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কৃতিত্বও ছিল তাঁর। ভাইদের প্রতি তাঁর স্নেহের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নৈতিক ও আদর্শিক জায়গায় আপসহীনতা। তাঁর ছোট ভাই ঈশানচন্দ্রের প্রতি পিতার ভালোবাসা ও প্রশ্রয় ছিল প্রশ্নাতীত। ঈশানচন্দ্র অলস ও উশৃঙ্খল জীবনযাপন করে বারবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই ঋণ শোধ করার জন্য পিতা বিদ্যাসাগরকে নির্দেশ দেন। অথচ সেসময় বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ছোট ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্রে এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঈশানচন্দ্রকে কাজের ব্যবস্থা করে দিলেও সে কোনো কাজ করেনি। আগেও তার ঋণ বিদ্যাসাগর পরিশোধ করেছেন। ফলে এই অকর্মণ্য ভাইয়ের কার্যকলাপ যেমন তাঁকে ব্যথিত করেছে, তেমনি বেদনার্ত করেছে ঈশানচন্দ্রের প্রতি পিতার অন্ধ ভালোবাসা। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্রয়েই বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে– এমন ধারণা ছিল বিদ্যাসাগরের। তাই পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও, জীবনের শেষ পর্বে এসে অভিমানের তীব্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর। ছেলে নারায়ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মানসিক দূরত্ব ছিল আরও তীব্র। একারণে উইলে পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করলেও ছেলেকে বঞ্চিত করেছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর তাঁর উইলের ২৫ নং ধারায় উল্লেখ করেছেন :

> আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। (উদ্ধৃত: বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৫৬০)

আত্মজকে ত্যাজ্য করার এই সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দিনময়ী দেবী মেনে নিতে পারেননি। ফলে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর মানসিক দূরত্ব তীব্রতর হয়।

নীতির প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব বিদ্যাসাগর তাঁর জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীর ক্ষেত্রেও দেখিয়েছেন। ১৮৮৮ সালে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সূর্যকুমারকে পদচ্যুত করেন তিনি। সূর্যকুমারের অপরাধ ছিল কলেজের আয়-ব্যয়ের খাতায় হিসেবের গরমিল। নীতি ও আদর্শের জন্য জামাতাকে বরখাস্ত করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। (মিত্র, ২০০১ : ৩৬৬)

অত্যন্ত স্নেহের ভাই দীনবন্ধুর সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ঘটে ১৮৬৮ সালে। এ সময় তাঁর তৈরি প্রেসের কাজ ভালোভাবে চলছিল না। এ কারণে তিনি সংস্কৃত ডিপজিটরী যন্ত্র ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তিকে দান করে দিতে চান। বিদ্যাসাগরের তখন প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মতো ঋণ

ছিল। তাই দীনবন্ধু প্রথমে প্রেস বিক্রিতে আপত্তি তুলেন এই যুক্তিতে যে, প্রেস বিক্রি করে বড়জোড় দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। এই টাকায় বিদ্যাসাগরের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করা সম্ভব। এরপরও বিদ্যাসাগর প্রেস বিক্রি করতে চাইলে দীনবন্ধু প্রেসের মালিকানা দাবি করে বসেন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ানোর উপক্রম হয়। "তখনই ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য দুর্গামোহন দাস নামের এক সম্ভ্রান্ত উকীলকে সালিসি নিযুক্ত করেন। সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয় শম্ভুচন্দ্র ও পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বরকে এবং আরও কয়েকজনকে।" (অধিকারী, ১৯৭০ : ১০৭) শেষ পর্যন্ত লিখিত পত্রের মাধ্যমে দীনবন্ধু প্রেসের মালিকানার দাবি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু এই ঘটনার ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি আর্থিকভাবে সহায়তা করতে চাইলেও দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরের টাকা ফিরিয়ে দেন। এই পরিস্থিতির জন্য বিদ্যাসাগরের স্বভাবগত একগুয়েমিকে কিছুটা দায়ী করা যায়। তবে চূড়ান্ত বিচারে পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিস্বার্থের কাছে মানবিক সম্পর্কও যে ম্লান হয়ে যায় তাঁর প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

এই ঘটনার এক বছর পর ১৮৬৯ (১২৭৬ বঙ্গাব্দ) সালে ভাইদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। এই বছর, ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামের জনৈক শিক্ষক বাল্যবিধবা মনোমোহিনী দেবীকে বিয়ে করতে চান। বিদ্যাসাগর প্রথমে খুশি হয়ে এই বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য বীরসিংহ গ্রামে আসেন। কিন্তু পরে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদাররা এসে বিদ্যাসাগরের কাছে প্রতিজ্ঞা আদায় করিয়ে নেন যে, তিনি এই বিয়ে দিবেন না। মুচিরাম ছিল হালদারদের ধর্মপুত্র। যে বিদ্যাসাগর বিধাববিবাহ দেওয়ার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তিনিই এই বিধবাবিবাহে নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজি হয়ে গেলেন। হয়তো ততদিনে সমাজের কাছে এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাছে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর উৎসাহ অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে জনৈক কৈলাশ মিশ্র এবং বিদ্যাসাগরের ভাই দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্র সেই বিয়ে সম্পন্ন করলেন। এ খবর জানতে পেরে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বিশেষ করে "ঈশানচন্দ্রের রূঢ় ভাষা ও আচরণে তিনি এতই আহত হন যে, সঙ্গে সঙ্গে বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্কছেদের সংকল্প গ্রহণ করলেন।" (অধিকারী, ১৯৭০ : ১০৮) এই ঘটনার পর আরও বাইশ বছর বেঁচে থাকলেও তিনি আর কখনো তাঁর নিজ গ্রাম বীরসিংহে ফিরে যাননি। এভাবে পিতা, ভাই, পুত্র, স্ত্রী সবার সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগর ১২৮৭ সালে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাছে লেখা পত্রে তিনি আক্ষেপ করেছেন এভাবে:

> আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দ্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৩৬৮)

আবার সবার প্রতি তীব্র অভিমান নিয়ে তাঁর প্রিয় গ্রাম বীরসিংহ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির প্রতিউত্তরে তিনি লেখেন :

> আমার নিতান্ত মানস ছিল, আপনকার ও জননীদেবীর জীবদ্দশা পর্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কালযাপন করিব। কিন্তু উত্তরোত্তর সকলেই আমার উপর এত নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতায় আর সে সকল সহ্য করিয়া কাল হরণ করা হইয়া উঠিল না। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৩৩৮)

পরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই দূরত্ব তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছে অনিবার্য বিষাদ ও বিচ্ছিন্নতা। অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রভাবতীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর লেখেন *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)। এই গ্রন্থেও বিদ্যাসাগরের মনোবেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়:

> বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি নানা, কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোন অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। (বিদ্যাসাগর, ১৩৮৯ : ২০১)

উপর্যুক্ত বিভিন্ন কারণেও বিদ্যাসাগর বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছেন বলে আমরা ধারণা করতে পারি। বিচ্ছিন্নতাবোধে জর্জরিত মানুষ নিজ সমাজ-সংস্কৃতি ও কাজের ক্ষেত্র থেকে অনেক সময় আলাদা হয়ে যান। সিম্যান বর্ণিত বিচ্ছিন্নতার পাঁচটি ধরনের একটি হল অন্যদের থেকে বিচ্ছেদ (isolation)। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "The fourth type of alienation refers to *isolation*. –This usage is most common in descriptions of the intellectual role, where writers refer to the detachment of the intellectual from popular cultural standards – one [...] has become estranged from his society and the culture it carries." (Seeman, 1959 : 788) বিদ্যাসাগরকেও আমরা বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়ে স্বসমাজ ও সংস্কৃতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে দেখি। জীবনের শেষপর্ব কাটাতে দেখি কার্মাটাড়ে, সাঁওতালদের সান্নিধ্যে।

উপসংহার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল অবিচল আত্মবিশ্বাস, কর্মসম্পাদনে একাগ্রতা, আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীনতার সমন্বয়ে। সেই সঙ্গে স্বভাবগত জেদী মনোভাবও তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সর্বদা সমাজ ও পরিবারের মঙ্গলচিন্তায় সময়-শ্রম-অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। প্রতিদানে সামাজিক সম্মান ও পারিবারিক মমতা যেমন পেয়েছেন; তেমনি সমাজ ও পরিবার থেকে নিগ্রহ ও বঞ্চনাও কম পাননি। তাই জীবনের শেষ পর্বে এসে বাবা-মা-ভাই-স্ত্রী-সন্তান-বন্ধু প্রত্যেকের সঙ্গেই মানসিক বিচ্ছেদ ঘটেছে তাঁর। ফলে আমরা একজন নিঃসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন বিদ্যাসাগরকে আবিষ্কার করি। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধীনে শিক্ষা-সংস্কার করতে গিয়ে নিঃসঙ্গতা অনুপ্রবেশ করেছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে। বিধবাবিবাহ প্রথা প্রণয়নসহ অন্যান্য সমাজসংস্কার আন্দোলনের সময় রক্ষণশীল-সংকীর্ণমনা-সুবিধাবাদী শ্রেণির বহুমাত্রিক রূঢ় আচরণে বিক্ষত বিদ্যাসাগরের জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রসারিত হচ্ছিল ব্যাপক পরিসরে। পরিশেষে প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙন তাঁকে অনিবার্যভাবে করে তুলে হতাশ ও বেদনাহত। ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত এই নৈঃসঙ্গ্য দূর করার উপায় হিসেবে তিনি বেছে নেন সাঁওতালদের সমাজ। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর পিতাকে লেখা চিঠিতে বলেন: "...সংসারে সংস্রব পরিত্যাগ করাতে আমার কোন অংশে অনুমাত্র ক্ষতিবোধ না হইয়া বরং সর্বাংশে সম্পূর্ণ লাভ বোধ হইয়াছে। এতদিন অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা ভোগ ও অহোরাত্র আন্তরিক যাতনা ভোগ করিতেছিলাম। এক্ষণে সকল প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছি।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৩৩৮)

এভাবেই বাঙালির সমাজমুক্তির পথদ্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খুঁজে নিয়েছিলেন মানসিক প্রশান্তি আর বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্তির পথ।

সহায়কপঞ্জি :

অধিকারী, সন্তোসকুমার। ১৯৭০। *বিদ্যাসাগর*। কলকাতা: রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী।

আলী,এ.এফ., ইমাম। ১৯৯৮। *সমাজতত্ত্ব*। ঢাকা: ইনস্টিটিউট অব অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি।

করিম, সরদার ফজলুল। ২০০৬। *দর্শন কোষ*। ঢাকা: প্যাপিরাস।

ঘোষ, বিনয়। ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*। কলিকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। ১৯৯৭। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক)। ২০১০। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩৬০। *বঙ্কিম রচনাবলী*। (প্রথম খণ্ড: সমগ্র উপন্যাস)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ। ১৯৯০। *বিদ্যাসাগর*। কলিকাতা: স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। ১৩৮৯। *বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার*। কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশাস।

মিত্র, ইন্দ্র। ২০০১। *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*। কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সরকার, বিহারীলাল। ১৯৯১। *বিদ্যাসাগর*। কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ।

Fromm, Erich.1968. *The Sane Society*. New York: Rinehart.

Israel, Joahim. 1971.*Alienation : From Marx To Modern Sociology*. Boston :Allyn and Bacon.

Kahler, Erich. 1957.*The Tower And The Abyss.*New York : Braziller.

Seeman, Melvin. Dec, 1959. "On the meaning of Alienation", *American Sociological Review,* vol. 24, No 6. Published by: American Sociological Association.